রেলওয়ে-২

রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান : সব আছে, হৃৎপিণ্ডটাই নাই

নাহিদ হাসান

"২০ বছর মেয়াদী একটি রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করেছি এবং সেখানে ২৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আমাদের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে–দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম, কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া, পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা, ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর এবং খুলনা-মংলা নতুন রেললাইন/পুনর্নির্মাণ, মেহেরপুর জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল সার্ভিস চালু করা, যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তরে রেলসেতু নির্মাণ, ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটার গেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ ইত্যাদি। অন্যদিকে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 'আখাউড়া-আগরতলা' রেল কানেকটিভিটি স্থাপন করতে যাচ্ছি আমরা।"- অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ৪ জুন ২০১৫

অর্থমন্ত্রী ঘোষিত পুরো পরিকল্পনাটিতে কোথাও কারখানা শব্দটি নেই। ইতিমধ্যে মাস্টারপ্ল্যানের ৩৮ হাজার কোটি টাকা বেশ কিছু প্রকল্পে খরচও হয়েছে, স্টেশনগুলো রি-মডেলিং হওয়া যার অন্যতম। রি-মডেলিং প্রকল্পের একটি স্টেশন আখাউড়া রেলওয়ে জংশন। এই জংশন স্টেশনের রি-মডেলিং বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয় ৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। একই সঙ্গে ওই স্টেশনের ইন্টারলকিং সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন বাবদ আরো ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। অর্থাৎ মোট ২৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা রি-মডেলিং বাবদ দেওয়া হয়। এই রি-মডেলিংয়ের টাকা থেকে অনধিক ২০ কোটি টাকায় একটি অত্যাধুনিক রেল ইঞ্জিন ক্রয় করেও অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কাঁচামালের জোগান দেওয়াসহ রেলওয়ে কারখানায় ওভার টাইম চালু করে কমপক্ষে ২০টি আন্তনগর ট্রেনের অকেজো শোভন চেয়ার কোচ মেরামত করা যেত। মেরামতকৃত সেই কোচ ও সংগৃহীত ইঞ্জিনের সমন্বয়ে গঠিত আন্তনগর ট্রেনটি ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে চলাচলের ফলে রেলের বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেত প্রায় ১৪ কোটি ২৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার বেশি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শায়েস্তাগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুমিল্লা, লাকসাম, ফেনী ইত্যাদি রেলস্টেশনসহ দেশব্যাপী এরকম সকল স্টেশনে ব্যাপক অর্থ ঢালা হয়েছে। এই যে নতুন নতুন রুট তৈরি হচ্ছে, এটা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। কিন্তু পুরনো রুটগুলোতে কি চাহিদামতো ইঞ্জিন, বগি, ওয়াগন সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে? উত্তর হবে–না। তারপর নতুন রুটের জন্য যে ইঞ্জিন, বগিগুলো লাগবে, তা কোথায় পাওয়া যাবে? আনা হবে ভারত ও চীন থেকে।

অনধিক ২০ কোটি টাকায় একটি অত্যাধুনিক রেল ইঞ্জিন ক্রয় করেও অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কাঁচামালের জোগান দেওয়াসহ রেলওয়ে কারখানায় ওভার টাইম চালু করে কমপক্ষে ২০টি আন্তনগর ট্রেনের অকেজো শোভন চেয়ার কোচ মেরামত করা যেত।

অন্যদিকে মাস্টারপ্ল্যানের লক্ষ কোটি টাকা থেকে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার আধুনিকায়নে মাত্র ১২২ কোটি ২২ লাখ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। পাহাড়তলী রেল কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০০৭ সালে জাপানের জেবিআইসি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার মিলে ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে যে পুনর্বাসন প্রকল্পটি নিয়েছিল তার কাজই শুরু হয়নি। এ দুই কারখানার শতকরা ৮০ ভাগ যন্ত্রাংশই ব্রিটিশ যুগের, যা অনেক আগেই উৎপাদনক্ষমতা হারিয়েছে। লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) তৈরির লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৯২ সালের ১৪ মে পার্বতীপুরে 'কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা' প্রতিষ্ঠা করা হলেও ইঞ্জিন তৈরির উদ্যোগ কোনো সরকার গ্রহণ করেনি!

২.

১৯৭০ সালে আসাম-বেঙ্গল রেলপথকে ঘিরে ব্রিটিশরাজ প্রতিষ্ঠিত সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাটি প্রতিষ্ঠাকালীন শত শত মেশিনের শব্দ ও কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর পদচারণে মুখরিত ছিল। আর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের নির্বাচিত সরকারের আমলে 'রিকভারি প্রোগ্রাম'-এর আওতায় রেলওয়ের লোকবল ৫৮ হাজার থেকে ৩৫ হাজারে নামিয়ে আনা হয়। বিশেষত কমিয়ে আনা হয় কারখানা শ্রমিকদের। যেমন প্রতিষ্ঠাকালীন সৈয়দপুর কারখানায় মঞ্জুরীকৃত পদ ছিল ৪ হাজার, তা ২০০৩ সালে নেমে আসে ১৬২১ জনে। পার্বতীপুর রেল কারখানায় মঞ্জুরীকৃত পদ ১৬৯৯ জনের বিপরীতে আছেন ১০৩৬ জন আর পাহাড়তলীতে ২১২৮ জনের বিপরীতে আছেন ১২৩৩ জন। অর্থাৎ সবগুলো কারখানাই ৪০ শতাংশ কম লোকবল নিয়ে চলছে। শুধু লোকবলের ঘাটতির কারণেই ইঞ্জিন, ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামতের সুযোগ থাকলেও অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বাইরে থেকে মেরামত ও আমদানি করতে হচ্ছে। অথচ জাতিসংঘ বলছে, কাজের অভাবে মানুষ সাগর পাড়ি দিচ্ছে। অন্যদিকে যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দপুর কারখানার কর্মচারীদের ৭০ শতাংশ এবং শ্রমিকদের ৯০ শতাংশের বয়স ৫০-এর ঊর্ধ্বে। পাহাড়তলী কারখানায় কর্মচারী ও শ্রমিকদের ৪৫ শতাংশের বয়স ৫০-এর ঊর্ধ্বে।

গবেষণায় দেখা গেছে, একটি মালবাহী ট্রেন ২১০টি পাঁচটনি ট্রাকের সমান মালামাল পরিবহনে সক্ষম। এবং পরিবেশ দূষণের হার ৩০ ভাগের ১ ভাগ। অথচ ৫২টি পরিবহন লাইন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লালমনিরহাট বিভাগের প্রতিটি স্টেশন থেকে মাল খালাসের ও গোডাউনের সংযোগ লাইনসমূহ।

৩.

বাংলাদেশ রেলওয়ে নিউজ লেটার, সংখ্যা ১১, মে-অক্টোবর/২০১১ থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনামলের শেষে এদেশে মাত্র ৬০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে ৯০০০০ কিলোমিটার হয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীনে ২১০০০ কিলোমিটার এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের অধীনে প্রায় ৬৯০০০ কিলোমিটার। অন্যদিকে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ছিলো ২৮৫৮ কিলোমিটার। পরে তা কমে হয়েছিল ২৭৪৫ কিলোমিটার। বর্তমান সরকারের আমলে তা দাঁড়িয়েছে ২৮৩৫.০৪ কিলোমিটারে।

অথচ বাংলাদেশ রেলওয়ে তার সকল অবকাঠামো নির্মাণ, রোলিং স্টক সংগ্রহ ও অন্যান্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব ব্যয় বহন করে। অন্যদিকে সড়ক ব্যবহারকারী পরিবহন কোম্পানিগুলো সড়কপথের সুবিধা ব্যবহার করলেও সড়ক নির্মাণ বা মেরামতের কোনো ব্যয় বহন করে না। অবকাঠামো খাতে নির্মাণ ব্যয়ের ৬৫% রেল থেকে উঠে এলেও সড়ক খাত থেকে টোল আদায়ের মাধ্যমে আসে মাত্র ৩৫% (অথচ যোগাযোগ খাতের ৮০% ব্যয় সড়ক খাতে হয়ে থাকে)। তার ওপর রেলওয়ে বর্তমানে ১০টি হাসপাতাল, ৩২টি ওষুধের দোকান, ১০টি স্কুল সরাসরি পরিচালনা করে। এজন্য স্বাস্থ্য খাতে ২২ কোটি টাকা এবং শিক্ষা খাতে ১০ কোটি টাকা রেলওয়ে রাজস্ব বাজেট থেকে ব্যয় হয়। এসব হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি জনগণও এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা পায়। মুক্তিযোদ্ধা, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা বিনা খরচে রেলের মাধ্যমে যাতায়াত করার সুযোগ পান, যা সড়কপথে অসম্ভব।

৪.

ব্রিটিশ আমলে তৈরি ৩০০ কিলোমিটার রেলপথ ও দেড় শ স্টেশন উচ্ছেদ করা হয়েছে গত ৪৩ বছরে! ভারতবন্ধু দুই জোটের আমলেই রেল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতীয় মডেল সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। ১২০০ একর জমির ওপর ১৯৮৭ সালে পাঞ্জাব প্রদেশের কাবুর থালায় যে রেলওয়ে কারখানা ভারত সরকার স্থাপন করে, তা প্রতিবছর ১৫০০ কোচ উৎপাদন করে, যা ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। অথচ ১৮৭০ সালে ১১০ একর ভূমির ওপর বাংলাদেশে সৈয়দপুর রেল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ পর্যন্ত তার আধুনিকায়ন হয়নি। উল্টো যা যন্ত্রপাতি আছে তা অব্যবহারে ধ্বংসের মুখে। অথচ ইতিমধ্যে খরচ হয়ে যাওয়া ৩৮ হাজার কোটি টাকার মধ্যে কারখানা তিনটিতে এক হাজার কোটি করে মোট তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা গেলে তা দিয়ে প্রয়োজনীয় জনবল, কাঁচামাল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক বিপুলসংখ্যক ইঞ্জিন, কোচ, ওয়াগন মেরামতের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন না করে গ্রামের পর গ্রামে বিদ্যুতের তার-খুঁটি লাগিয়ে যেমন লাভ নেই, তেমনি রেল কারখানাগুলোকে আধুনিক ও উৎপাদনক্ষম না করা গেলে রেলপথ ও স্টেশনগুলো নিথর হয়ে পড়ে থাকবে। কারখানা নামক হৃৎপিণ্ডটা না থাকলে রেললাইন নামক শিরা-উপশিরা প্রাণহীন হতে বাধ্য! রেল পুনর্জাগরণের কথা তখন প্রতারণা ছাড়া আর কিছু হবে না!

নাহিদ হাসান : প্রধান সমন্বয়ক, রেল-নৌ যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণকমিটি, কুড়িগ্রাম

ইমেইল: nahiduttar@yahoo.com

নিয়মিতই বিকল হচ্ছে রেলের ইঞ্জিন

এক মাসে বিকল ৩২টি

সূত্র: বণিকবার্তা ১৯ অক্টোবর ২০১৫